পরিবেশ দূষণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বয়স্ক শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর জন্য নির্বাচিত নং ১১১/এডি/ঈ/তাং ২৭/১/৮৭

পরিবেশ দূষণ

শিশিরকুমার চক্রবর্তী এম..এ.

জাতীয় সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত

দি বুক ট্রাস্ট

৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ৭৩

প্রকাশক :
অলক মুখোপাধ্যায়
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নতুন সংস্করণ-১৯৮৮

মূল্য : **চার টাকা** মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশ দূষণে যা জানার আছে

পরিবেশ দূষণ

জল হাওয়া মাটি নিয়ে
মোদের পরিবেশ,
এদের দূষণ ঘটলে পরে
দুখের নাহি শেষ।
শব্দ দূষণ সেটাও খারাপ
ঘটায় নানা রোগ।
রোগের বৃদ্ধি আয়ু কম
এ কি রে দুর্ভোগ।

জল, হাওয়া আর মাটি

এই তিনটি জীবের জীবন। এই তিনটি দূষিত হলে সুস্থ জীবন যাপন করা যায় না। কিন্তু নানাকারণে মানুষ জল, হাওয়া আর মাটিকে দূষিত করে চলেছে। তার সঙ্গে রয়েছে শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণ মানে, মানুষের শব্দ সহ্য করার একটা নির্দিষ্ট শক্তি আছে। পরিবেশে কোন কারণে তার চেয়ে বেশী জোরে শব্দ হওয়া খারাপ। তার ফলে মনের শান্তি নষ্ট হয়; শরীরে নানাবিধ রোগ দেখা দেয়।

পরিবেশ দূষণ একটি জাতীয় সমস্যা। দেশের লোকসংখ্যা যত বাড়ছে, ততই বন কেটে বসত তৈরী হচ্ছে। বন কেটে চাষের জমি তৈরী হচ্ছে। বন কেটে তৈরী হচ্ছে বড় বড় কল-

কারখানা। মানুষের ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাতে, বনের বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে চলবে দিনে দিনে। কিন্তু জমি তো বাড়বে না। তাই বন কেটেই মানুষ বসত তৈরী করবেই। বন পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে নানাভাবে। সে কথা পরে আলোচনা করা হবে।

পৃথিবীতে আজ যন্ত্র বিজ্ঞানের জয়-জয়কার। মানুষ আজ চাঁদের মাটিতে পা ফেলেছে। রকেট যানে মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছে। ভোগ-বিলাসের জন্য কত নতুন নতুন দ্রব্যসামগ্রী তৈরী হচ্ছে। তার ফলে দিনের পর দিন কত নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে। সেইসব কলকারখানার ধোঁয়ায় হাওয়া দূষিত হচ্ছে। কলকারখানার গড়ানি জল পড়ছে নদীতে ও সাগরে। তার ফলে জল দূষিত হচ্ছে। কল-কারখানার শব্দে শব্দ দূষণ ঘটছে। মানুষ জেনে এবং না জেনে পুকুর, কূপ ও নলকূপের জলও দূষিত করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

জমির ফসলে আজকাল নানাবিধ রোগনাশক, কীটনাশক এবং আগাছানাশক রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। সেই সব জমির জল পুকুরে, নদীতে এবং নদী থেকে সাগরে পড়ে। তার ফলে জমি দূষিত হয়। ঐসব রাসায়নিক ওষুধ এক ধরনের বিষ। সেই বিষের প্রভাবে পুকুর, নদী ও সমুদ্রের মাছ এবং জলজ গাছপালার ক্ষতি হয়। ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন প্রভৃতি ওষুধের বিষক্রিয়া সহজে নষ্ট হয় না। জলে, মাটিতে

এবং ফল ও ফসলে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত থাকে। মানুষের শরীরে চর্বির নীচে, ঐসব ওষুধের কণা জমতে থাকে ক্রমশঃ। পরে ফলে শরীরে নানাবিধ রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঐসব ওষুধের বিষময় প্রভাবে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের শরীরেও নানারূপ জটিল ও দুরারোগ্য রোগ দেখা দিতে পারে।

যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য দেশে মোটর, বাস ও রেলগাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে। এরোপ্লেন, এয়ারবাস প্রভৃতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশঃ। ঐসব যানবাহনের জ্বালানি-পোড়া ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে হাওয়া, ঘটচ্ছে শব্দ দূষণ।

আপন খেয়াল-খুশির বশে মানুষ শব্দ দূষণ ঘটাচ্ছে নানা-ভাবে। যে কোন উৎসব আজ মাইক ছাড়া অচল। সারা দিন, সারা রাত অবিরাম মাইকের শব্দে কান পাতা দায় হয়ে ওঠে। তাছাড়া পূজা, উৎসব, ফুটবল কি ক্রিকেট খেলায় প্রিয় দল জিতলে, কত বোমা, বাজী, ফট্‌কা ফোটান হয়, হাউই ছোঁড়া হয়। তাছাড়া আজ মিছিল, কাল শোভাযাত্রা, পরশু প্রতিবাদ দিবস। তা নিয়ে চীৎকার, মাইক বাজানো ও ফট্‌কা ফোটানো চলে খেয়াল-খুশী মত।

লোভী মানুষ পুকুরের জলে রাতের অন্ধকারে ফলিডল ঢেলে দেয়। ফলিডলের বিষক্রিয়ায় মাছ মরে ভেসে ওঠে। সেই মাছ বিক্রি করে। যারা সে মাছ খায়, তাদের শরীরে মৃদু বিষক্রিয়া তো হয়ই। উপরন্তু সেই পুকুরের জলে তাদের বাড়ির লোকজনও হয়ত স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে।

জল দূষণের ফলে সকলের শরীরে যে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে—সেকথা কেউ ভেবে দেখে না।

আজ সাবধান হওয়ার দিন এসেছে। এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান না হলে, মানুষের জীবনে চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে। পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে সাবধান হলে, এখনও আমরা নানাবিধ রোগভোগের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। আমাদের বংশধরদের সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ দিতে পারি। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশে আজ সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীর দল কত গবেষণা করছেন। কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছেন মানুষকে। প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেন্টও পরিবেশ দূষণ-রোধে অনেক আইন-কানুন তৈরী করছেন। মানুষকে সচেষ্ট করার জন্য নানাভাবে প্রচার চলছে। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। আমরা যেন যে ডালে বসে আছি, সেই ডালটিকেই কেটে চলেছি। ডালটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা যে পড়ে গিয়ে আঘাত পাব, তা বুঝেও বুঝছি না। নানাভাবে পরিবেশকে দূষিত করে, মানুষ যেন নিজের কবর খুঁড়ছে; নিজের চিতার কাঠ নিজে সাজাচ্ছে। মানুষের জীবনে এ-এক বিরাট সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য, যার যতটুকু সাধ্য, তার তা করা উচিত নয় কি?

কি ভাবে জল, হাওয়া ও মাটি দূষিত হয়

জল দূষণ

জল আমাদের জীবন। বেঁচে থাকার জন্য আমরা জল পান করি। জলে আমরা স্নান করি। চাষের কাজে সেচের জন্য জলের প্রয়োজন। রান্নাবান্না, ধোওয়া-মোছা ও রকমারি জিনিসপত্র তৈরীর কাজে জল দরকার। জলে মাছ ও যেসব প্রাণী বাস করে, মানুষ তা খায়। অনেক জলজ আগাছা খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। অথচ মানুষ নানাভাবে জল দূষিত করছে। তার ফলে নানা অসুখ-বিসুখ ; এমনকি মৃত্যুও ঘটে। আজকাল আন্ত্রিক রোগের বড়ই প্রকোপ। জল দূষণের জন্য আন্ত্রিক রোগ হয়। অথচ দূষণ রোধের জন্য আমরা তেমন চেষ্টা করি না। দূষিত জল শোধন করে নিয়েই বা কজন পান করি। অথচ তা যে প্রয়োজন তা আমরা জানি।

পুকুরের জল দূষণ

পুকুরের জল দূষণ নিয়ে ভারি একটি মজার গান আছে। এ গানের শিক্ষা সকলের মেনে চলা উচিত।

জলকে যে তুই জীবন বলিস রাখিস কি তার মান।
সেই জীবের জীবন ঘটায় মরণ করলে পরে হতজ্ঞান ॥

যে জলে তুই কাপড় কাচিস
এঁটো বাসন নিত্য মাজিস
কেমন করে সেই জলেতে করিস রে তুই স্নান-পান।
হায় ভোলামন। হুঁসটি খোয়ালি
গো মহিষের গা যে ধোয়ালি
তাতে রোগবীজাণু ঢেলে দিলি এমনি অজ্ঞান॥
কতই বা আর বলি বারে বারে
টিউবওয়েল কুয়োর ধারে
ময়লা ফেলে কাপড় কাচে বাসন মাজে করে স্নান।
ময়লা সে জল চুঁইয়ে চলে যায়
কলের কুয়োর জলে মেশে হায়
এই ভাবে জল দূষিত হয় আমরা করি পান।
দুর্গাসুত ডেকে বলে তাই
যে জলে স্নান পানেরই কাজ ভাই
সেই জলেরই দূষণ থেকে হও সবে সাবধান।

যে পুকুরের জলে স্নান করা হয়, সেই পুকুরের জলে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কি গরু মহিষের গা ধোয়ান উচিত নয়। বিশেষতঃ রোগীর কাপড়-চোপড় কাচা, এঁটো বাসন মাজা, পুকুরের জলে প্রস্রাব করা ও পায়খানা করার পর ছোঁচান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। গ্রাম পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এ বিষয়ে চেষ্টা করলে কিছুটা কাজ হতে পারে।

আমরা নিজেরা টিউবওয়েলের জল পান করি। কিন্তু গবাদি পশুকে পুকুরের দূষিত জল খেতে দিই। গবাদিপশুর

রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেক বেশী। কিন্তু দূষিত জল পান করে গবাদিপশুর রোগ হতে পারে। সেই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে মানুষের মধ্যে। গবাদিপশুকেও তাই বিশুদ্ধ জল পান করতে দেওয়া উচিত।

তরি-তরকারী, চাল, ডাল ইত্যাদি খাবার জিনিস পুকুরের জলে না ধুয়ে, টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে নিলে, জল দূষণের কুফল থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

পুকুরের পাড়ে ঘন বন-জঙ্গল থাকা খুবই খারাপ। তার ফলে পুকুরের জলে ভালভাবে আলো হাওয়া পড়ে না। গাছপালার ঝড়াপাতা পুকুরের জলে পড়ে পচে। তাতে পুকুরের জল দূষিত হয়। জলে কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি জলজ আগাছা জন্মালেও পুকুরের জল দূষিত হয়। ডাক পুরুষের কথায় আছে ঃ

মুখ হালকা, ভেতর গোঁজা, দীঘল ঘোমটা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল বড়ই মন্দকারী ॥

বনের ভিতরে অবস্থিত পুকুরের জল দূষণ সম্বন্ধে মহাভারতে একটি সুন্দর ঘটনা আছে। ঘটনাটি এইরূপ ঃ

পাণ্ডবেরা তখন বনবাসে দিন কাটাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন দ্রৌপদী। বার বৎসর বনবাসের আর মাত্র একমাস বাকি আছে। এমন সময় তাঁরা যমুনার তীরে শূরসেন নামে এক বনে এসে উপস্থিত হলেন। জায়গাটি তাঁদের খুব ভাল লাগল। পাণ্ডবেরা ঠিক করলেন যে সেখানে তাঁরা কিছুদিন থাকবেন। একদিন বনে ঘুরতে ঘুরতে যুধিষ্ঠিরের ভীষণ পিপাসা পেল। ধারে কাছে কোথাও পুকুর নেই। যুধিষ্ঠির তখন ভীমকে ডেকে বললেন, ভীম, দেখ তো কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা। তখন ঃ

আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করেন গমন।
যে বনে না পায় জল করে অন্বেষণ ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবন নন্দন যায় পবনের গতি ॥

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটি পুকুর দেখতে পাওয়া গেল। পুকুরে নেমে সেই জল পান করা মাত্র ভীমের মৃত্যু হল। ভীমের খোঁজে অর্জুন, নকুল ও সহদেব একে একে সেই পুকুরের খোঁজে গেলেন। সেই পুকুরের জল খেয়ে একে একে সকলেরই মৃত্যু ঘটল। সবশেষে যুধিষ্ঠির তাঁদের খুঁজতে বেরিয়ে দেখলেন যে, পকুরের ধারে চার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন ঃ

দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতনে ছট্‌ফট্‌ করে নৃপমণি ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির ॥
পুনর্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘন ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥

* * *

নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে ॥

* * *

এতবলি নরপতি অধৈর্য হইয়া।
মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥

তবে যুধিষ্ঠির মারা যাননি। বক নামে এক যক্ষের গুণপনায় ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই জীবন ফিরে পান। হয়ত তাঁরা মরেননি। হয়ত দূষিত বিষাক্ত জল পান করে মৃতবৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ ছিল না। মহাভারতের কবি বেদব্যাস এই ঘটনাকে নিয়ে বেশ একটি সুন্দর কাহিনী লিখে গেছেন সাজিয়ে গুছিয়ে। দিনে দিনে এই কাহিনীর সঙ্গে নতুন ঘটনাও যোগ হয়েছে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ব্যাসদেব চিরকালের মানুষকে জীবন সম্বন্ধে বেশ সুন্দর শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বক নামে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে তিনটি মজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কিবা বার্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে,
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে ?

কি আশ্চর্য ? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, রোজই মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটছে। আমরা তা নিজের চোখে দেখছি। যে-কোন মুহূর্তে আমাদেরও মৃত্যু হতে পারে। তবু সবাই ভাবে সে এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবে। এটাই আশ্চর্য।

পথ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, মহাজন অর্থাৎ সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা যা করেন, তা করা উচিত। সেটাই পথ।

কে সুখী ? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন, কারও কাছে যার কোন ঋণ বা দেনা নেই সে যদি ঘরে থেকে দিনের শেষে কোন মতে শাক ভাত জুটিয়ে খায় সেই-ই সব চাইতে সুখী।

জল দূষণের কথা বলতে গিয়েই মহাভারতের কথা বলতে হল। মহাভারতের প্রতিটি ঘটনা থেকেই লোকশিক্ষা পাওয়া

যায়। একালের কোন যুধিষ্ঠির হয়ত বলবেন, যে দূষিত জল ব্যবহার করে না ; সে নীরোগ হয়। নীরোগ লোক পরিশ্রম করতে পারে বলে তাকে ঋণ করতে হয় না। যার কোন ঋণ নেই তার মত আর সুখী নেই।

চুরি করে মাছ ধরার জন্য রাতের অন্ধকারে পুকুরের জলে ফলিডল দেওয়া খুবই জঘন্য অপরাধ। তা মহাপাপ। তাতে শুধু পুকুরের মালিকের লোকসান হয় না। যারা সেই জল ব্যবহার করে, তাদেরও ক্ষতি হয়। পুকুরের জলে ফলিডল দিলে সে জল কিছুদিন ব্যবহার না করাই উচিত। জলে ওষুধ দিয়ে জল শোধন করার কিছুদিন পর, সেই পুকুরের জল ব্যবহার করা দরকার।

পুকুরের জল শোধনের উপায়

পুকুরের জল দূষণের কারণগুলি আগেই বলা হয়েছে। মাঝে মাঝে পুকুরের জলে চুন এবং পারমাঙ্গানেট অফ পটাস. দেওয়া উচিত। তাহলে পুকুরের জল অনেকাংশে দোষমুক্ত হয়। পুকুরের চারপাশে ঘন-জঙ্গল ও আগাছা কেটে ফেলা উচিত। তাহলে পুকুরের জলে বেশ আলো-হাওয়া খেলতে পারে। পুকুরের জল থেকে নানা ধরনের পানা তুলে ফেলে দেওয়া দরকার।

মাঝে মাঝে পুকুরের জল ছেঁচে ফেলে দিয়ে পাঁক কেটে তুলে ফেলা দরকার।

আজকাল পুকুরের জল কেউ খায় না বললেই চলে। টিউবওয়েলের জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে খাওয়া উচিত। অথবা হ্যালোজেন ট্যাবলেট দেওয়া জল খাওয়া দরকার। হ্যালোজেন ক্লোরিন জাতীয় ওষুধ। এই ওষুধ জীবাণুনাশক।

নদী ও সাগরের জল দূষণ

আজকাল বড় বড় নদীর ধারে মেলাই কলকারখানা গড়ে উঠছে। নদীর ধারে শব দাহ করে। আধপোড়া শব অনেক সময় নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। মড়া পোড়ানোর পর চিতা ধুয়ে নদীর জলে পড়ে। গবাদিপশুর মৃতদেহ নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। বাড়ি ঘর এবং গাঁও শহরের নর্দমার জল নদীতে গিয়ে পড়ে। তাছাড়া, বড় বড় নদীর দুই তীরে দিনে দিনে মেলাই কলকারখানা গড়ে উঠছে। রাসায়নিক ও নানাবিধ ধাতব দ্রব্য মিশ্রিত জল গিয়ে পড়ছে নদীতে। গাঁয়ের শস্যক্ষেতে রোগ ও কীটশত্রু দমনের জন্য রাসায়নিক ওষুধ দেওয়া হয়। মাঠ ধোওয়া সেই জল নদীতে পড়ে, বিষাক্ত করে দেয় নদীর জল। তার ফলে নদীর জল নিয়তই দূষিত হচ্ছে। নদীকে তাই নদী না বলে বড়সড় আকারের নর্দমা বলাই ভাল। নদীর জল গিয়ে পড়ছে সাগরে। জাহাজের তেল পড়ে দূষিত হচ্ছে সাগরের জল। জাহাজ থেকে নানারূপ আবর্জনা সাগরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। তার ফলেও সাগরের জল দূষিত হয়।

অনেকে নদীর জল পান করে, স্নান করে নদীতে। এভাবে জল দূষিত হওয়ার ফলে, মানুষ রোগগ্রস্ত হয়। দূষণের ফলে মাছ ইত্যাদি জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয়। সাগরের জল দূষণ সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। জলে একধরনের শেওলা ও আগাছা হয়। মাছ ইত্যাদি জলজ প্রাণী সেসব শেওলা ও আগাছা খেয়ে বেঁচে থাকে। দূষণের ফলে সে সব শেওলা ও জলজ আগাছা আগের মত হয় না। মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী তাই কমে যাচ্ছে দিনে দিনে।

নদী ও সাগরের জল দূষণ রোধ

নদী ও সাগরের জল দূষণ রোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের করার কিছুই নেই। যাঁরা জন প্রতিনিধি, যাঁরা বিধানসভার সদস্য, যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েতের সদস্য তাঁরা কি এ বিষয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করছেন। জল দূষণ রোধ সম্পর্কে আইন তৈরী করার জন্য তাঁরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। ঘরোয়া বৈঠক, জন সমাবেশ ইত্যাদি করে জল দূষণ রোধ সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করাও তাঁদের কর্তব্য। কলকারখানার ময়লা ও দূষিত জল নর্দমায় ছাড়ার আগে শোধন করার জন্য তাঁরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। একটা হিসাবে দেখা গেছে যে গঙ্গায়, নদীতে রোজ নানাভাবে মোট ৭ লক্ষ ঘন মিটার ময়লা এসে পড়ে। এইসব ময়লা থেকে ২00 টন নাইট্রোজেন, ৫0 টন ফসফরাস ও ১00 টন পটাশ সার পাওয়া যেতে পারে। তার দাম ২0 কোটি টাকারও উপর। হাওড়া-কলকাতার ৩৪৬টি খোলা মুখ নর্দমার জল গঙ্গায় এসে পড়ে। অনায়াসে এই জল শোধন করে নিয়ে নদীতে ফেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নদী ও সাগরের জল দূষণ রোধের জন্য জনসাধারণকে সচেতন করা উচিত। তার জন্য প্রচার চাই। দেশের বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর ; অর্থাৎ লিখতে পড়তে জানে না। তাই রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে জল দূষণ রোধের উপায়গুলির কথা ঘন ঘন প্রচার করতে হবে। গান, কথকতা ও অভিনয়ের মাধ্যমে জল দূষণ রোধের উপায় লোককে যত জানান যায়, দেশের ততই মঙ্গল।

আমাদের দেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক সময় নদীর জল দূষিত করা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলি গঙ্গা হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র নদী। গঙ্গায় স্নান করলে মানুষের নাকি পাপ মুক্তি হয়। গঙ্গা জল স্পর্শ করলে অশুচি মানুষ শুচি হয়। গঙ্গার তীরে শবদাহ করলে, মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি ঘটে। শবদাহের আবার কয়েকটি বিশেষ স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। যেমন কাশীর মণি কণিকার ঘাট, পশ্চিমবাঙলার ত্রিবেণী ; কলকাতার নিমতলার ঘাট ইত্যাদি। যাঁরা কাছাকাছি থাকেন বা যাঁদের শববহনের মত সঙ্গতি আছে তাঁরা গঙ্গার তীরে ঐ সব বিশেষ শবদাহের ঘাটে আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ দাহ করেন। যাঁরা তা পারেন না তাঁদের জন্য ধর্মের আলাদা বিধান আছে। মড়া পোড়ানোর পর এক টুকরো হাড়, একতাল কাদার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। কাদা সহ সেই হাড় গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'গঙ্গায় অস্থি দেওয়া'। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, মানুষের মন এখনও এই অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। গঙ্গার তীরে শবদাহ করা এবং গঙ্গায় অস্থি দেওয়ার ফলে ধর্মের নামে একটি পবিত্র নদীর জল অহরহ দূষিত করা হয়। প্রচলিত ধারণা, ধর্ম মাহাত্ম্যে গঙ্গার জল দূষিত হয় না ; গঙ্গার জলে রোগ জীবাণু থাকে না। এ ধারণা যে ভুল তা নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। গঙ্গার জলও ফুটিয়ে বা অন্যভাবে বীজাণু মুক্ত করে পান করা উচিত।

গঙ্গা সম্বন্ধে মানুষের ধর্মবোধকে কাজে লাগিয়েই গঙ্গার জল দূষণ রোধে সকলকে সজাগ করে তুলতে হবে। আমরা বলি গঙ্গা আমার মা। জয় মা গঙ্গা। কিন্তু মায়ের শরীর দূষিত হলে, ছেলের শরীরও যে খারাপ হয় সেটা বুঝি না বলেই

গঙ্গার জল দুষিত করি নানাভাবে। ধর্মের নামে গঙ্গার জল দুষণ করে আমরা পাপ করি। তা সকলের বোঝা দরকার; সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

বায়ু দূষণ

হাওয়া বা বায়ুর অপর নাম প্রাণ। আমরা বায়ুর সমুদ্রে ডুবে রয়েছি। বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন নামে একটি গ্যাস আছে। আমরা যে প্রশ্বাস নিই তার ভিতর দিয়ে শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করে। জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। একজন মানুষ সারা দিনে বাইশ হাজার বারের মত প্রশ্বাস গ্রহণ করে। সেই প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করে ষোল কিলোগ্রামের কম-বেশী।

হাওয়ায় অক্সিজেন ছাড়াও অনেক গ্যাস আছে। তার মধ্যে অনেকগুলিই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। ওরকম একটি গ্যাসের নাম কার্বন ডাই-অক্সাইড। আমরা প্রশ্বাসের সাহায্যে অক্সিজেন নিই। আমরা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে হাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। আমরা যে উনান জ্বালাই, তার ধোঁয়া হাওয়ায় মেশে। কলকারখানা, রেল, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন থেকে নির্গত ধোঁয়া বাতাসে মেশে। তার ফলে বাতাসের অক্সিজেন কমে, কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পায়। বাতাসের অক্সিজেন কমা মানেই বায়ু দুষিত হওয়া।

শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নয়, ধূলিকণাও বায়ুকে দুষিত করে। শুধু কি ধূলিকণা—বিভিন্ন ফুলের পরাগরেণু বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়ায় ভাইরাস, ব্যাক্‌টিরিয়া ও ছত্রাক রেণু, আগাছাবীজ, কলকারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে নির্গত নানা

অধাতব পদার্থের ছোট ছোট কণা। এগুলি এত ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না। তুলো ও পাটের আঁশ, পশু-পাখির পালক ও লোমের টুকরো, ধূলিকণা এবং নানা ধাতব ও অধাতব পদর্থকণার জন্য নানা ধরনের অ্যালার্জি ঘটিত রোগ ও সর্দি-কাশি হয়।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নানা ধরনের কণিকা যত বৃদ্ধি পায়, আবহাওয়া তত উত্তপ্ত হয়। আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে এমন হতে পারে যে শীতকাল বলে কিছুই থাকবে না।

আজকাল মানুষ নানা রকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে। তার মূল কারণ কিন্তু বায়ু দূষণ। ডিজেলের ধোঁয়ায় সূক্ষ্ম কার্বন কণা থাকে এগুলি ক্যান্সার রোগের মূল। পেট্রোলের ধোঁয়ায় থাকে সীসার কণা। তা স্নায়ু এবং পাকস্থলীর ক্ষতি করে। কল-কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় থাকে সালফার ডাই-অক্সাইড। সালফার ডাই-অক্সাইড ফুসফুসকে অকেজো করে তোলে। দূষণের ফলে বায়ুতে নাইট্রোজেন-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই বিষাক্ত গ্যাসটি শ্বাসনালীতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

শিশুরা খেলাধূলা ও দৌড়াদৌড়ি, ঝাঁপাঝাঁপিতে মত্ত থাকে। তাই তারা প্রশ্বাসের সঙ্গে বেশী বাতাস গ্রহণ করে। একটি শিশু বড়দের তিনগুণ বাতাস গ্রহণ করে প্রশ্বাসের সঙ্গে। শিশুরা প্রতিদিন বাতাসের সঙ্গে নানা ক্ষতিকর বিষ আপন আপন শরীরে গ্রহণ করছে। কলকারখানা ও গাড়ির পেট্রোল, ডিজেল পোড়া ধোঁয়ায় সিসে জাতীয় বিষ থাকে। সিসে জাতীয় বিষ মাটি থেকে এক বা দেড় মিটার উচ্চতায় বায়ুতে ভাসে। শিশু-

দের উচ্চতা তার চাইতে বেশী হয় না। সিসে জাতীয় বিষে বায়ু দূষণের ফলে বড়দের চাইতে তাই শিশুরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কলকারখানা ও মোটরগাড়ি থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তাতে থাকে পারাক্সিল নাইট্রেট। এই পদার্থটি মাটি থেকে অল্প উচ্চতায় কুয়াশার সঙ্গে মিশে হাওয়ায় একটি স্তর বা পদার্থ সৃষ্টি করে। নীচের দূষিত বায়ু সেই স্তর ঠেলে উপরে উঠতে পারে না। এরই নাম ধোঁয়াশা। নগর জীবনে ধোঁয়াশা একটি বিরাট অভিশাপ। ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। লণ্ডনে এরকম ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। অন্ধকারে ঢেকে যায় সারা শহর। গাড়ি-ঘোড়া যা যেখানে ছিল সেখানেই থেমে যায়। যাঁরা রাস্তায় ছিলেন তাঁরা পড়েন দুর্ঘটনার কবলে। এই ধোঁয়াশার ফলে অনেকেই হার্ট ও শ্বাসনালীর রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। লণ্ডন শহরের চার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলকাতা ও বড় বড় শিল্প নগরীতেও এরকম ভয়াবহ ধোঁয়াশার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

গ্রামের বায়ু দূষণ

আজকাল গ্রামের বায়ুও নানা কারণে দূষিত হয়ে থাকে। কলকারখানার চাহিদা যোগাতে গাছ কেটে উজাড় করে ফেলা হচ্ছে গ্রামের বন থেকে। বন কেটে বসত ও চাষের জমি তৈরী করা হচ্ছে। বায়ু দূষণে বনের ভূমিকার কথা পরে বলা হবে। গাঁয়ের লোক আজকাল জ্বালানী হিসাবে কয়লাই বেশী ব্যবহার করে। গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক পিচ ঢালা পাকা রাস্তা তৈরী হয়েছে।

সেই রাস্তায় মেল্লাই মোটর লরী বাস ইত্যাদি চলাচল করে। শহরাঞ্চলের কাছাকাছি গাঁ-গুলিতে ছোট-বড় রকমারি কল-কারখানা গজিয়ে উঠেছে দিনের পর দিন। সেই সব কল-কারখানার ধোঁয়া বাতাসে মিশে দূষিত করছে গ্রামের বাতাসকে। শস্যরক্ষার জন্য চাষের জমিতে ছেটান হচ্ছে নানা-বিধ রোগ, কীট ও আগাছা নাশক ওষুধ। সেই সব ওষুধের কণা বাতাসে মিশে দূষিত করে তুলছে গাঁয়ের বাতাসকে। আগে শহরের লোক হাওয়া বদল করার জন্য গ্রামে যেত। কিন্তু গ্রামের বাতাসও আজ কম-বেশী দূষিত।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। গাঁয়ের বায়ু কিভাবে দূষিত হয়ে চলেছে তার উদাহরণ দিই। হুগলী জেলায় বারোল নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি পূর্ব রেলপথের কলকাতা-বর্ধমান মেন লাইনের ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে দশ কিলোমিটার দূরত্বে দিল্লী রোডের ধারে অবস্থিত। গ্রামে ঢোকার মুখেই শ্রীবাদল চন্দ্র ঘোষের আদর্শ কলাবাগান, অপূর্ব নার্শারী। বাদলবাবু একজন আদর্শ চাষী। কলা উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও কৃষিপণ্ডিত উপাধি পান। যে কলার কাঁদির জন্য তিনি পুরস্কার পান সেটি ছিল জায়েন্ট গভর্ণর জাতের কলা; কাঁদির ওজন ছিল ৬৫ কেজি।

চাষবাসই বাদলবাবুর জীবিকা। হঠাৎ একদিন তার কলাবাগানের সামনের জমিতে গজিয়ে উঠল একটি ছোটখাট গন্ধকের কারখানা। কারখানার চিমনী ছোট। কারখানার ধোঁয়ায় গাঁয়ের বাতাস হয়ে উঠল দুর্গন্ধময়। একদিন কারখানার বয়লার ফেটে গেল। বয়লার ফাটা ধোঁয়ার উত্তাপে কারখানার

গাছপালার পাতা ঝলসে গেল। বাদলবাবু স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে আবেদন করলেন। গাঁয়ের লোকেরা প্রতিকারের জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানালেন পশ্চিমবাংলার পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের কাছে। ফলেতদন্ত হল। কারখানায় আরও উঁচু চিমনী বসান হল। কিন্তু গাঁয়ের বুক থেকে হটানো গেল না গন্ধকের কারখানাটিকে। কিছুদিন পরে কলাবাগানের আর এক প্রান্তে গজিয়ে উঠল রাজু ইনডাস্ট্রিস। কয়লা থেকে গুল তৈরীর কারখানা। গ্রামের যুবশক্তি কি পঞ্চায়েত থেকে বাধা দিলে হয়ত বারোল গ্রামে কারখানা তৈরী হত না। বায়ু দূষণের হাত থেকে গ্রামের লোক বাঁচত। শুধু বারোল নয়, কলকাতার কাছাকাছি অনেক গ্রামে এভাবে কলকারখানা, ইট-ভাঁটা গড়ে উঠছে। তার ফলে দূষিত হচ্ছে গ্রামের পরিবেশ।

বায়ু দূষণ রোধের উপায়

দিনে দিনে যেভাবে কলকারখানা গজিয়ে উঠছে, বাস, মোটর ও রেলগাড়ির চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে, আকাশে উড়ছে এরোপ্লেন, জলে ভাসছে জাহাজ, মহাকাশে ছুটেছে রকেট— তাতে বায়ু দূষণ রোধের উপায় বলা খুবই কঠিন। কলকারখানা ও মোটর গাড়ি প্রভৃতিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করলে বায়ু দূষণ কিছুটা কম হতে পারে। সভ্যতা এক ছদ্মবেশী রাক্ষসী। সেই রাক্ষসীর মোহিনী মায়ায় মানুষ আজ মোহগ্রস্ত। সেই সভ্যতা রাক্ষসীর খোরাক যোগাতে,দেশে আরও কলকারখানা গড়ে উঠবে। রাস্তায় আরও গাড়ি-ঘোড়া মোটর

ছুটবে। ভোগ-বিলাসের জন্য লালায়িত মানুষ বড় বড় গাছ কেটে উজাড় করে দেবে। তার ফলে নিয়ত পরিবেশ দূষিত করে মানুষ ডেকে আনবে নিজের সর্বনাশকে।

তাহলে কি বায়ু দূষণ রোধের আশা দুরাশা মাত্র ! না, তাও নয়। কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে, বায়ু দূষণের সম্ভাবনাকে অনেকখানি রোধ করা যায়। সূর্যের আলোকে বিশেষ উপায়ে সংহত করে, তা দিয়ে রান্নাবান্না ও গাড়ি চালানোর কাজ করা যেতে পারে। তা নিয়ে নানাবিধ পরিক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

দেশে কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রসার চাই। নতুন কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা বন্ধ করে, কুটিরশিল্পের প্রসারে গভর্ণমেন্টকে বিশেষ উদ্যোগী হতে হবে। কুটিরশিল্পের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী তৈরী হয় সেসব দ্রব্যসামগ্রী তৈরীর জন্য কারখানা খোলার কি প্রয়োজন? আইন করে এ ধরনের কারখানা খোলা বন্ধ করা উচিত। প্রশ্ন উঠতে পারে দেশে যত কল-কারখানা গজিয়ে উঠবে বেকার ছেলেমেয়েরা তত কাজ পাবে। সুতরাং নতুন কলকারখানা তৈরী করা বন্ধ রাখলে হিতে বিপরীত হতে পারে। কিন্তু কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রসারে 'এক ঢিলে দু'পাখি মারা পড়বে।' বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানও হবে; আবার বায়ুদূষণও অনেকাংশে কমে আসবে।

গ্রামের বায়ু দূষণ রোধ করার জন্য কি করা যায়—সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলি:

গ্রামের বন নির্মূল এবং বন থেকে গাছ কাটা যতদূর সম্ভব

কম করতে হবে। প্রয়োজনে একটি গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি গাছ বসান চাই। শুধু বৃক্ষরোপণ নয় ; গাছের চারা লাগানোর পর, সেটি যাতে গরু ছাগল খেয়ে না ফেলে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভেঙ্গে না ফেলে, উপড়ে না দেয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। গাছ লাগিয়ে, বাখারির তৈরীর ঘেরাটোপ দিয়ে তা ঘিরে রাখলে, শিশু তরুটির অকালে নষ্ট হয় না। শুধু সুরক্ষা নয় ; শিশু তরুটির বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সেচ ও সার দেওয়া ও নানা-বিধ পরিচর্যার প্রয়োজন। পরিবেশ দূষণ রোধে গাছের ভূমিকার কথা সবশেষে আলোচনা করা হবে।

জমির ফসলে রোগ, কীট ও আগাছা নাশক ওষুধ প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক ও সাবধান হতে হবে। রোগ, কীট এবং আগাছা নাশক ওষুধ যত কম প্রয়োগ করা যায়, ততই মঙ্গল। তাতে শুধু বায়ু দূষণ নয় ; মাটি দুষণ এবং জল দুষণও অনেক কম হবে।

তার জন্য চাই পরিচ্ছন্ন ও সতর্ক চাষ। জমির মাটি ও আলের চারিপাশ, নিড়ানীর সাহায্যে নিড়িয়ে ও কোদাল দিয়ে কুপিয়ে একেবারে আগাছা মুক্ত রাখা চাই। আগাছা বেশী থাকলে জমির ফসলে রোগপোকার উপদ্রব বেশী হয়।

রোগ ও পোকার আক্রমণ সহনশীল উন্নতজাতের ফসলের চাষ করা চাই। এক এক ধরনের জাতের ফসলে এক এক ধরনের রোগপোকার আক্রমণ বেশী হয়। সেসব ফসলের চাষ-আবাদ না করাই ভাল।

জমিতে একই ফসলের চাষ বার বার করলে রোগপোকার আক্রমণ বেশী হয়। এ কথাটি মনে রেখে জমিতে পালাক্রমে নানাবিধ ফসলের চাষ করা দরকার।

যে দিকে হাওয়া বইছে, তার বিপরীত দিকে মুখ করে রোগপোকা ও আগাছানাশক ওষুধ ছেটান উচিত।

সম্ভব হলে আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ না করাই ভাল। আগাছা অন্নপূর্ণার ঝাঁপি। অনেক আগাছা মানুষ শাক হিসাবে খায় যেমন গোয়ালে নটে, বাথুর, ডিমা, সুষনী, কলমী, হেলেঞ্চা। অনেক আগাছা নানাবিধ রোগের মহৌষধ। যেমন—থানকুনি, কুলেকহাড়া, শ্বেত বেড়েলা, আমরুল ইত্যাদি। আগাছানাশক ওষুধ ব্যাপকহারে প্রয়োগ করলে এইসব আগাছা সমূলে লোপ পাবে।

জ্বালানী হিসাবে গাঁয়ের বেশীর ভাগ মানুষ আজকাল কয়লা ও ঘুঁটে ব্যবহার করে। কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হয় তা আগেই বলা হয়েছে। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এইসব গবাদি পশু থেকে দৈনিক দু'লক্ষ টন গোবর পাওয়া যায়। এই গোবরের বেশীর ভাগ ঘুঁটে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়; কিছুটা জৈব সার হিসাবে দেওয়া হয় জমিতে। এই গোবর থেকে গ্যাস তৈরী করে জ্বালানী ও আলো জ্বালার কাজে ব্যবহার করলে দৈনিক হাজার হাজার টন কয়লা ও খনিজ তেলের খরচ কম হত। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে যেত; তার ফলে বায়ু দূষণ অনেক কম হত। গ্যাস তৈরী হয়ে যাওয়ার তলানি, গোবরসার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা চলত। গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানোর জন্য গভর্ণমেন্ট আজকাল গ্রামের লোককে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। খাদি কমিশন থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক থেকে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানর জন্য ঋণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গ্রাম-পঞ্চায়েত পরামর্শ দেয় আরও নানাভাবে সাহায্য

করে থাকে। গ্রামবাসী একা না পারুন, সমবায় সমিতি গঠন করে গ্রামে গ্রামে গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট বসাতে পারেন। তাতে গ্রামের বায়ু দূষণ রোধ হবে ; সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও সাশ্রয় ঘটবে। গ্রামে কলকারখানা যত কম খোলা হয়, ততই মঙ্গল। কল-কারখানায় গ্রামের বনসম্পদ ধ্বংস হয়। সেই সঙ্গে দূষিত হয় গ্রামের বাতাস। গ্রামের যুবশক্তি এ বিষয়ে সমবেতভাবে বাধা দিতে পারেন ; চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। গ্রামে কলকারখানা না খোলার ব্যাপারে গ্রাম-পঞ্চায়েতেরও উদ্যোগী হওয়া উচিত।

কলকারখানা খুললেও কয়েকটি বিষয়ে গ্রামের যুবশক্তি ও পঞ্চায়েতকে চোখ কান খুলে রাখতে হবে। তাহলে যথাসম্ভব বায়ু দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। যেমন ঃ—

● কলকারখানা খোলার জন্য বেশী গাছপালা কেটে না ফেলা। প্রয়োজনে গাছপালা কাটতে হলেও সঙ্গে সঙ্গে কারখানার আশেপাশে কি কারখানা সংলগ্ন জমিতে নতুন গাছ লাগানো এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

●● কারখানা কর্তৃপক্ষ যাতে কারখানা খোলা ও কারখানা চালানোর আইন-কানুন মেনে চলেন সে বিষয়ে কড়া নজর রাখা। আইন অমান্য করে কাজ করার চেষ্টা করলে বাধা দেওয়া ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

●●● কারখানায় যাতে দূষণ নিবারক সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে নজর রাখা।

●●●● কারখানায় পুরানো যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং চিমনী ব্যবহার করা হলে বাধা দেওয়া।

●●●●● লোকালয়ের আশেপাশে কারখানা না বসিয়ে গ্রামের একপ্রান্তে, লোকালয় থেকে দূরে কারখানা বসান।

চাকরি বাকরি কি কাজকর্মের লোভে গ্রামে কলকারখানা খুলতে দেওয়া 'খাল কেটে কুমীর ঢোকানো'র সামিল। গ্রামবাসী ও গ্রাম-পঞ্চায়েতকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

মাটি দূষণ

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাটির দূষণ রোধ করা দরকার। নানাভাবে মাটি দুষিত হয়। নির্বিচারভাবে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে। বনভূমি নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে মাটির প্রয়োজনী উপাদানগুলি কমে যাচ্ছে দিনের পর দিন। মাটির বুকে ঝরে পড়ে গাছের পাতা ও শুক্‌নো ডালপালা। নানা ধরনের জীবাণুরা সেগুলিকে 'হিউমাস' নামক একটি উপাদানে পরিণত করে। এই হিউমাস মাটিকে উর্বর করে। হিউমাসের অভাবে মাটি ঊষর মরুময় হয়ে ওঠে, মাটির ক্ষয় সাধিত হয়।

কলকারখানার ধাতুমল ও নানাবিধ আবর্জনা জমা হচ্ছে মাটির বুকে। তার ফলে মাটির গঠন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে মানুষের ভোগ-বিলাসের চাহিদা। মানুষ আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী জিনিসপত্র ব্যবহার করে। শিশি-বোতল, টিনের কৌটা, কাপড়-চোপড়, রবার, নাইলন, প্লাস্টিক, চামড়ার তৈরী রকমারি জিনিসপত্র, খেলনা, জুতো, ছাতায় মানুষের ঘর বোঝাই। ঘরবাড়ির আবর্জনার সঙ্গে সেইসব জিনিসপত্র

জন্য সরকার একটি নতুন কর্মসূচী নিয়েছেন। সে কর্মসূচীর নাম, সামাজিক বনসৃজন। তার জন্য সরকারের বনবিভাগ থেকে বিনাদামে নানাধরনের গাছের চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সামাজিক বনসৃজনের দরকারী কথাগুলি পরে বলা হবে।

কথা হচ্ছে, গাছ কোথায় লাগান হবে। প্রথম কথা, প্রয়োজন না থাকলে গাছ কাটবেন না। একেবারে উপায় না থাকলে গাছ কাটুন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি গাছ লাগাতে হবে। শুধু লাগান নয়। চারপাশে বেড়া দিয়ে গরু ছাগলের হাত থেকে গাছটিকে রক্ষা করতে হবে। নিয়মিত সেচ, সার ও রোগ পোকা দমনের ওষুধ দিতে হবে। তাহলেই গাছটি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠবে, সতেজ ও সুপুষ্ট হয়ে চারদিকে ডালপালা মেলে ধরবে।

নিজের জমিতে জায়গা থাকলে গাছ অবশ্যই লাগাবেন। তাছাড়া সরকারী পতিত জমিতে, রাস্তার পাশে, খাল ও নদীর বাঁধ, ইস্‌কুল পাঠশালার ফাঁকা মাঠের ধারে, একটি কি দুটি গাছের চারা লাগান ও তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করুন। এমনকি ধানখেতের আলে ইউক্যালিপটাস, বাবলা ইত্যাদি গাছ লাগান যেতে পারে। গাছের পাতা পড়ে জমিকে উর্বর করবে। গাছের ডালে পাখি এসে বসবে। পাখিতে পোকামাকড় খেয়ে জমির শস্যরক্ষা করবে।

ইস্‌কুল কলেজের ছেলেরা, ব্যব্যহারিক সাক্ষরতা কেন্দ্রের পড়ুয়ারা একটি করে গাছ অনায়াসে লাগাতে পারেন। তাকে বড় করে তুলতে পারেন। তাতে দেশে গাছের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

আগে আমাদের দেশে গাছ লাগানকে একটা ধর্ম বলে মনে

করা হত। প্রত্যেক পরিবারের কেউ না কেউ একটি অশ্বত্থ বা বটের চারাকে যত্নে রক্ষা করতেন। গাছ একটু বড় হলে, পূজো করে সেই গাছ প্রতিষ্ঠা করা হত। প্রতিষ্ঠা করা গাছ কেউ কাটতে সাহস করত না। বৈশাখ মাস ধরে সেই গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হত। এখন ধর্মের জন্য না হোক কর্মের জন্য প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটি করে গাছ লাগিয়ে তাকে বাঁচিয়ে বড় করে তুললে দেশের, দশের ও নিজের অনেক উপকার হবে।

পশ্চিমবাঙলায় ৩৩০৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। এক-একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্যসংখ্যা ৭২৫ জন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সভ্যসংখ্যা আটান্ন হাজারের কিছু বেশী। প্রত্যেক সভ্য একটি করে গাছ লাগিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলে বছরে রাজ্যে প্রায় ষাট হাজারের মত ছোট বড় গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

গাছ লাগান ও তাকে বাঁচিয়ে রাখা কেন দরকার? সে কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে। সকলের মনে তা গেঁথে দিতে হবে। ভাল কথা পরস্পর বলাবলি করলে, দশজনের মুখ থেকে দশবার শুনলে মন সেই দিকে আপনা আপনি ঝুঁকে যায়। তখন সেই কথামত কাজ করতে ইচ্ছা করে। গাছ লাগানোর উপকারিতার কথা সবাইকে বলার জন্য প্রচার করা দরকার। গান, ছড়া, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে কিছু প্রচার করলে, তা সহজে মানুষকে বশীভূত করে। রেডিওতে আজকাল গান ও ছড়ার মাধ্যমে বীজ, সার, সেচ, স্নো, সাবান, তেলের কথা প্রচার করা হয়। শুনতে ভাল লাগে। গান ও ছড়ার মাধ্যমে গাছ লাগানর কথা প্রচার করলে, ভাল ফল পাওয়া যাবে বলেই ধারণা। গাছ লাগান বা বৃক্ষরোপণ সম্বন্ধে এই ছড়াটি গানের

ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলে আমরা মাটিতেই ফেলে দিই। এইভাবে নানা অবাঞ্ছিত পদার্থ দিনে দিনে জমা হচ্ছে মাটির বুকে। জৈব পদার্থ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু ধাতব পদার্থ মাটিতে মিশে যেতে পারে না। মাটিতে এইসব ধাতব পদার্থের উপস্থিতি বড়ই ক্ষতিকর। পরিত্যক্ত, ব্যবহারের অযোগ্য এইসব পদার্থ পুড়িয়ে ফেলা উচিত। তার ফলে কিছু ধাতু পুনরুদ্ধার করা যায়। পোড়ানোর ফলে যে ছাই পড়ে থাকে তা থেকে ইট তৈরী করা যেতে পারে। ভাঙ্গা শিশি বোতল এক জায়গায় জমিয়ে রেখে দেওয়া উচিত। সেগুলি 'কাচ ভাঙ্গা কেনা' লোকেরা কিনে নিয়ে গিয়ে কারখানায় বিক্রি করে। সেগুলিকে গলিয়ে আবার নতুন শিশি বোতল তৈরী করা যায়। নাইলন প্লাস্টিকের জিনিসপত্র সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে।

কীটনাশক ওষুধমাত্রই মাটির প্রচণ্ড ক্ষতি করে থাকে। মাটিতে অনেক উপকারী জীবাণু থাকে। কীটনাশক ওষুধের প্রভাবে সেই-সব উপকারী জীবাণুর দলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপকারী জীবাণুদের অভাবে মাটি শক্ত হয়, মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়।

জমিতে রাসায়নিক সার দেওয়া হয়, ফলন বৃদ্ধির জন্য। রাসায়নিক সার দিলে, ফলন আপাততঃ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পরিণামে মাটির গঠনের ক্ষতি হয়।

আজকাল আমাদের দেশেও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। তার ফলেও মাটি দূষিত হচ্ছে।

হাজার হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সেইসব কয়লা পোড়া ছাই মাটিতে জমা হয়ে মাটিকে দূষিত করছে।

শব্দ দূষণ

শব্দ এক ধরনের শক্তি। শব্দের শক্তি যে কত ভীষণ বাজ পড়া থেকেই তা বোঝা যায়। বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা জানালা ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে। কানে তালা ধরে যায়।

শব্দের শক্তি যে কত ভীষণ তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। আকাশে জেট বিমান উড়ছে, রাস্তায় চলেছে মোটর বাস, টেম্পো, লরি, তাদের হর্ণ বেজে চলেছে জোরে জোরে। শনিপূজার মণ্ডপে মাইক বেজে চলেছে একটানা। স্লোগান দিতে দিতে মিছিল বেরিয়েছে রাস্তায়। রাস্তায় চীৎকার করে চলেছে ফেরিওয়ালার দল। কলকারখানার ভোঁ বেজে চলেছে তো চলেছেই। মোহনবাগান ফুটবল খেলায় জিতেছে, তাই উৎসাহী ফুটবল প্রেমিকের দল পটকা ফোটাচ্ছে। পূজামণ্ডপে ছেলেরা ফোটাচ্ছে বাজি পটকা। চারিদিকে কেবল শব্দ আর শব্দ। কানে তালা ধরে যাওয়ার উপক্রম.পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। যতদিন যাচ্ছে শব্দের মাত্রা বেড়ে চলেছে দিনে দিনে।

জোর শব্দ মানুষের চরম ক্ষতি করে। অতিরিক্ত শব্দের ফলে মানুষের শরীর ও মনের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। মানুষ খেয়ালী বদ্‌রাগী ও খিট্‌খিটে্ হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত শব্দে শিশুদের স্মৃতিশক্তি কমে যায়। মানুষের দেহে আলসার মাথার গোলমাল, হৃদরোগ এবং সন্ন্যাস রোগের সৃষ্টি হয়। তীব্র শব্দে মাতৃজঠরের শিশুরও ক্ষতি হয়।

শব্দ দূষণ রোধ যতদূর সম্ভব করা উচিত। অযথা চিৎকার না করা, অযথা এবং জোরে মাইক না বাজান, মোটর লরী প্রভৃতি যানবাহনে সাইলেন্সার ব্যবহার করা, মাত্রা ছাড়িয়ে

গাড়ীর হর্ণ না বাজানো, জোরে রেডিও না চালানো, বেশী শব্দের বাজী পটকা না ফোটানো, মিছিলে অযথা চীৎকার না করা প্রভৃতি শব্দ দূষণ রোধের সহজ উপায়। কথায় বলে বেশী চীৎকার করলে পরমায়ু কমে যায়। কথাটি সর্বাংশে সত্য।

দূষণ রোধে গাছপালার ভূমিকা

গাছপালা পরিবেশ দূষণ রোধে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। গাছকে তুলনা করা চলে দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে। পুরাকালে দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করেছিল। সমুদ্র-মন্থনের ফলে প্রথমে অমৃত উঠল, পরে উঠল বিষ। সেই বিষের প্রভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম। দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষপান করে সৃষ্টি রক্ষা করলেন। বিষের জ্বালায় তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে গেল। তিনি খ্যাত হলেন নীলকণ্ঠ নামে।

মহাদেব বিষ পান করে সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন। গাছপালা জীবন সমুদ্রমন্থনজাত বিষকে অমৃতে পরিণত করছে, তা উপহার দিচ্ছে প্রাণিজগৎকে। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। গাছপালা সূর্যালোকের সাহায্যে সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে খাদ্যে পরিণত করে উপহার দিচ্ছে জীবকুলকে। গাছপালা এইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে গ্রহণ করে জীবকুলকে রক্ষা করছে উপরন্তু গাছপালা অক্সিজেন ত্যাগ করে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। একটি গাছ তার সারা জীবনে যে পরিমাণ অক্সিজেন দেয়, অঙ্কে তার দাম হল পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকা।

গাছপালা বাতাসের ধূলিকণা শোষণ করে বায়ুকে দূষণ

মুক্ত করে। ঝড়ের বেগকে প্রতিহত করে গাছপালা। বনভূমি মেঘকে আকর্ষণ করে বৃষ্টিপাত ঘটায়, তাই ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

গাছপালা মানুষের পরম বন্ধু। একটি গাছ একটি প্রাণ। তাই বন হনন নয়, পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষরোপণ একান্ত কর্তব্য। একটি গাছ কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দুটি গাছ লাগান ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার।

বৃক্ষরোপণের জন্য গভর্নমেন্টের বনবিভাগ থেকে আজকাল বিনামূল্যে নানা ধরনের গাছের চারা বিতরণ করা হয়। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থসাহায্যও করা হয়। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করলে বিনামূল্যে গাছের চারা ও অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। সরকারী খাস পতিত জমিতে আজকাল সামাজিক বনসৃজন করা হয়ে থাকে। তার জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য করা হয়। গ্রামের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ফাঁকা জমিতে রকমারি গাছ লাগানো যেতে পারে। শুধু গাছ লাগানো নয়, স্বার্থের বশে কেউ যাতে অকারণে গাছপালা না কাটে সে বিষয়ে গ্রামের যুবশক্তি ছাত্রসমাজ ও পঞ্চায়েতগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে। তবেই না দূষণমুক্ত করা যাবে পরিবেশকে।

গাছ কত কি কাজে লাগে

গাছ আমাদের কত কাজেই না লাগে। গাছ না থাকলে আমরা কাঠ পেতাম না। কাঠ না পেলে দরজা, জানালা, খুঁটি, খাট, কোদাল, কুড়ুল, বঁটি, কাটারি, কাস্তের বাঁট, নৌকা, লাঙল, দেশলাই এইসব তৈরী হত কি দিয়ে। রেল, লরি, বাস,

মোটর, সাইকেল-রিক্‌সা, গরুর গাড়ি, রিক্‌সাভ্যান, উড়ো-জাহাজ, স্টীমার এসব তৈরী করতেও কিছু না কিছু কাঠ লাগে। শুনলে অবাক হবে, আমরা যে বই পড়ি, যে কাগজে লিখি, তাও গাছ থেকে তৈরী হয়। দড়ি, কাপড় তৈরীর সুতো, কাপড় বোনার তাঁত– তাও গাছ থেকেই আমরা পাই। তাছাড়া, গাছপালা গরীব লোকের রান্নার কাঠ যোগায়।

এই গাছ কোথা থেকে পাওয়া যায়? সোজা কথা বন থেকে। অনেক গাছপালা, অনেক ঝোঁপ-ঝাড়, ঘাস ও লতাপাতা বিরাট বড় এলাকা জুড়ে থাকে। তাকেই বন বলা হয়। তাছাড়া, গাঁ ও শহরের পতিত জমিতে, চাষের জমির ধারে, পুকুরের পাড়ে, রাস্তার দু'পাশে, অনেক গাছ জন্মায়। অনেকে নানা-ধরনের ফল ও জ্বালানী কাঠের গাছ, বিরাট এলাকা জুড়ে লাগান। যেখানে এভাবে অনেক গাছ লাগান থাকে তাকে বাগান বলে।

আগে আমাদের দেশে বনের অভাব ছিল না, গাছের অভাব ছিল না এক-একটি গাঁয়ের অর্ধেকটা ছিল বন; অর্ধেকটা ছিল বসত। বসতের তাগিদেই বন তৈরী করা হত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত বন কেটে উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে। গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। তার নানা কারণও আছে। কারণগুলি পরপর বলা যাক:—

(১) জনসংখ্যা: যত দিন যাচ্ছে, দেশে লোকের সংখ্যা তত বাড়ছে। লোকসংখ্যার বাড়তির হার কমানোর জন্য আমরা জন্মশাসনের নিয়ম মেনে চলছি। কিন্তু তাহলে কি হবে। ধর কারও ১২ বিঘা জমি আছে। সে জন্মশাসন করল। তাই তার একটি ছেলে; একটি মেয়ে। তার বেশী ছেলে মেয়ে হল না।

তার বসতবাড়ির মাপ ৪ শতক বা ৩ কাঠা। সে মারা গেলে ভাগাভাগি করে ছেলে ও মেয়ে ৬ বিঘা করে জমি ও ৩ কাঠা করে বসতবাড়ির ভিটে পেল। সেই ছেলের দুটি ছেলে হল। তখন ৬ বিঘা জমি ভাগ হয়ে ৩ বিঘা করে এক এক ছেলে পেল। বসতবাড়ির জায়গা ভাগ হয়ে দেড় কাঠায় দাঁড়াল। দেড়কাঠা জায়গায় কি হবে। সে ঘর করবে; না গোয়াল করবে; না সব্জীবাগান করবে; না দু-চারটে ফল-ফুলের বাগান করবে। তখন সে কি করবে? তাদের এজমালি (সকলের) একটা পতিত জায়গা ছিল। সেখানে বন ছিল। সে সেই জায়গা থেকে নিজের ভাগমত জায়গা আলাদা করে নিল। সেখানকার বন কেটে বসতবাড়ি তৈরী করল।

অসুবিধাটা বোঝানর জন্য এই গল্পটি বলতে হল। কিন্তু গোটা দেশের অবস্থাটা এই গল্পের মত। নানাকারণে দেশে লোক বাড়ছে। দেশ ভাগ হওয়ার পর কত লোক যে এদেশে এসেছে, তার ঠিক নেই। তাদের বসবাস করার জন্য অনেক বন উজাড় হয়ে গেছে। শুধু বসবাসের জায়গা নয়; বনের গাছপালা কেটে চাষের জমি তৈরী হয়েছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, খাবারে টান ধরবেই। খাবার যোগাতে চাষের জমির এলাকা বাড়াতে হবে। তাই বন কেটে শুধু বসত নয়—চাষের জমিও তৈরী হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

(২) বসতবাড়ি ও আসবাবপত্র: যত বেশী ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে, তত বেশী কাঠ লাগছে। বন কেটে সেই কাঠ যোগাড় করা হচ্ছে। বাড়িঘর, অফিস, কোর্ট-কাছারির সংখ্যা যত

সুরে গেয়ে প্রচার করা যেতে পারে। এই বই যাঁরা পড়বেন তাঁরা যেন এই ছড়াটিকে মুখস্থ করে নেন। পরে সকলকে শোনান। দশজনের একজন উৎসাহ পেলেও বনসৃজনের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে :

বৃক্ষরোপণ! বৃক্ষরোপণ!
পরিবেশের রুখতে দূষণ
কল্পবি কেরে ?
আয় ছুটেরে।
নয়রে দেরী, এল লগন।
কর সামাজিক বন-সৃজন ॥
গাছ কেটে বাপ! করলি যে সাফ;
তার সাজাতি! পাচ্ছ খাঁটি।
নেইরে বৃষ্টি খরার সৃষ্টি
দৃষ্টি কোথায় সে দিকে মন!
বাতাস থেকে বিষ গ্যাসকে
শোষণ করে দেয় সে ভরে
অক্‌সিজেনে
নিয়েও মেনে
তবু কল্পি বৃক্ষছেদন
হায়রে, একি আত্মহনন।
ফুলে পাতায় জগৎ সাজায়,
ফলের বাহার বলব কি আর।
সব কিছু ভাই
গাছ থেকে পাই।

করি যে তাই জীবন ধারণ।
করিসনে ভাই বৃক্ষছেদন।
দূষ্য বায়ু কমায় আয়ু।
বিষকে বায়ুর, করছে সে দূর।
তাই সবে কয়,
বৃক্ষ তো নয়
বৃক্ষ যে হন, শিব ত্রিলোচন
মন্থন বিষ, করেন শোষণ।
শপথ নিলাম শপথ নিলাম
একটি করে বৃক্ষ ওরে
আমরা সবাই
লাগাব ভাই
করব তাকে লালন পালন।
করতে যুগের পাপ-স্খালন॥

সামাজিক বনসৃজন

আমরা বেশ বুঝতে পারছি, গাছপালা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। আবার গাছ না কেটেও উপায় নেই। তাই সুযোগ পেলেই গাছ লাগাতে হবে। পতিত জমিতে গাছ লাগাতে হবে।

কেউ হয়তো বলবে অপরের পতিত জমিতে গাছ লাগিয়ে আমার কি লাভ? আমি কি সে জমির গাছ ভোগ করতে পারব? সে তো অপরের জমি।

বাড়ছে, তত বেশী খাট, আলনা, চেয়ার, টেবিল, দরজা-জানালা লাগছে। সেই সব তৈরী করতে বন থেকে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। তাতে ব'নর আয়তন কমছে ; গাছপালার সংখ্যাও কমে যাচ্ছে দিনে দিনে।

(৩) কলকারখানা ও কুটীরশিল্প : যত লোক বাড়ছে, তত নানাধরনের আসবাবপত্রের চাহিদা বাড়ছে। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, যত উন্নত হচ্ছে, তত নতুন নতুন ভোগের সামগ্রী তৈরী হচ্ছে। সেসব আসবাবপত্র ও ভোগের সামগ্রী তৈরীর জন্য বড় বড় কলকারখানা হচ্ছে। নতুন নতুন কুটীরশিল্প গজিয়ে উঠছে। কলকারখানা বসানোর জায়গা পেতে বন কেটে ফেলা হচ্ছে। বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে বিরাট ইস্পাত কারখানা আছে। আগে সেখানে বিরাট বন ছিল। কারখানা তৈরী করতে বন কেটে ফেলতে হয়েছে। আবার কলকারখানা তৈরী করতেও কাঠ চাই। বন থেকে সেসব কাঠ যোগাড় করা হয়। কুটীর-শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও অনেক কাঠ লাগে। আমরা যে কাগজে লিখি, তা তৈরী করতেও কাঠ লাগে। সে কাঠ যোগাড় করতে বন কেটে উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে।

নানারকম শিল্পসামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরীর জন্য কাঠের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কা'ঠর দামও তাই বেশ চড়া। চড়া দামের লোভে অনেকে নিজের বাড়ি, বাগান ও বনের গাছপালা বিক্রি করে দেন।

(৪) যাতায়াত ও যোগাযোগ, বিজলী আলো : আগের তুলনায় দেশের যাতাযাত ব্যবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। আগের তুলনায় দেশের অনেক জায়গায় রেললাইন বসান হয়েছে। আরও অনেক জায়গায় রেললাইন বসান হবে। রেললাইন বসাতে কিছু

বন কাটা যায়। আবার রেলের লাইন বসানো, স্টেশন তৈরী ইত্যাদি কাজে কাঠ লাগে। সে কাঠ বন থেকেই কেটে আনা হয়। দেশে বাস, মোটর, লরি ইত্যাদির চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। সেসব চাহিদা মেটাতেও বন থেকে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে।

যোগাযোগের কাজেও কাঠের দরকার কম নয়। আজ রেডিও ঘরে ঘরে। রেডিও যোগাযোগের খুব ভাল মাধ্যম। রেডিওর বোতাম ঘোরালেই আমরা সারা দেশের খবর শুনতে পাই। কত গান, কত অভিনয়, কত ভাল ভাল জিনিসপত্রের খবরাখবর পাই। এই রেডিও তৈরী করতে প্রচুর কাঠের দরকার হয়। এই রেডিও তৈরী করতে প্রচুর কাঠের দরকার হয়। সে কাঠ বন থেকেই কেটে আনা হয়।

খবরের কাগজও যোগাযোগের একটি মাধ্যম। নানা ধরনের খবরের কাগজ আছে। কোন কোন খবরের কাগজ রোজ ছাপা হয়। সেগুলিকে বলে দৈনিক পত্রিকা। কোনটি বা সপ্তাহে একবার, কোনটি ১৫ দিনে একবার, কোনটি মাসে একবার প্রকাশিত হয়। এগুলিকে বলে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা। তাছাড়া সিনেমা, খেলাধুলা, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়েও অনেক খবরের কাগজ ছাপা হয়। খবরের কাগজের সংখ্যা যত বাড়ছে, তত বেশী কাগজ লাগছে। সেই কাগজ তৈরীর জন্য বন থেকে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।

আজ অনেক গাঁয়েই বিজলী আলো বা ইলেকট্রিক লাইট গেছে। ইলেকট্রিক লাইটের তার নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কাঠের খুঁটি লাগে। বনের গাছ কেটে সেইসব খুঁটি তৈরী করা হয়।

(৫) লেখাপড়া : যত দিন যাচ্ছে, মানুষের লেখাপড়া শেখার

ইচ্ছা বাড়ছে। আজ তাই গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্‌কুল। যাঁরা ছেলেবেলায় লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি তাঁদের জন্য খোলা হচ্ছে ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্প। আজকাল গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শেখার জন্য ইস্‌কুলে ভর্তি হয়। লেখাপড়া করার জন্য বই ও খাতার চাহিদা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের বই পড়ার চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। তাই পড়ার বই ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ধর্মপুস্তক, গোয়েন্দাকাহিনী প্রভৃতি বই প্রচুর ছাপা হয়ে থাকে। আগেই বলেছি বই ছাপার জন্য প্রচুর কাগজের দরকার। কাগজ তৈরীর জন্য কাঠের দরকার। বনের গাছ কেটে সে চাহিদা মেটানো হচ্ছে। তাতেও বন কেটে উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

(৬) অন্যান্য ঃ কত আর বলা যাবে। আগেই বলা হয়েছে বন গরীব লোকের জ্বালানী যোগায়। বনের নানারকম গাছ থেকে আমরা রকমারি ওষুধ ও রকমারি জিনিসপত্র পেয়ে থাকি। ইউক্যালিপটাস ও আরও কিছু গাছের আঁশ থেকে রেয়ন তৈরী হয়। বনের গাছ থেকে বের করা হয় নানারকমের রঙ, রজন ও তেল। আজকাল ঘরে ঘরে প্লাসটিকের জিনিসে ছড়াছড়ি। প্লাসটিকের কাঁচা মাল বন থেকেই পাওয়া যায়।

নাচ, গান, অভিনয়ের জন্যও কাঠ লাগে। সেতার, এসরাজ, তানপুরা, হারমোনিয়াম, ছাতার বাঁট, রাইফেল বন্দুকের কুঁদো, দাদুর হাতের ছড়ি সবই তৈরী হয় কাঠ থেকে। অভিনয় ও নাচের জন্য স্টেজ তৈরী করা হয়, কাঠের পাটা বা তক্তা দিয়ে। তার জন্যও কত কাঠ লাগে। এ সবের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না। আর সে চাহিদা মেটাতে গাছপালা কেটে ফেলায় বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

গাছ কাটা ছাড়া উপায় নেই

বোঝাই যাচ্ছে গাছ কাটা ছাড়া কোনও উপায় নেই। বন কেটে বসত গড়তেই হবে। ভালভাবে বেঁচে থাকতে গেলে, লেখাপড়া শিখতে হলে, বই পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হলে, নতুন নতুন কল-কারখানা গড়তে হলে, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করতে হলে অনেক অনেক কাঠ চাই। অনেক বন কেটে ফেলতে হবে। যদি বলা হয় গাছ আমাদের বন্ধু। গাছ আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে। গাছপালা থাকলে সুবৃষ্টি হয়। গাছপালা ভূমিক্ষয় রোধ করে। অতএব গাছ কাটা চলবে না। বন কেটে বসত গড়া চলবে না। তাহলে তো চলবে না। গাছ কাটলেও ক্ষতি। আবার গাছ না কাটলে ভালভাবে বাঁচা যাবে না। এ যেন এগুলে-ও নির্বংশ ; পেছুলেও সর্বনাশ। এ যেন 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।'

তাহলে আমরা করব কি

তাহলে আমরা করব কি ? 'যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে' এমন একটা উপায় তো বের করা চাই। যাতে সব দিক রক্ষা পায়।

সে উপায় আছে। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। সে উপায়টি যেন একটি মন্ত্র। সেটি হচ্ছে এই ঃ

একটি গাছ। একটি প্রাণ !

গাছ লাগান। গাছ বাঁচান।

দেশের সকলকে গাছ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহী করার

আমি বলি, হাঁ পারবেন? কি করে? আগেই বলা হয়েছে, গাছ বৃষ্টি নামায়। ভূমিক্ষয় রোধ করে। বাতাসকে নির্মল রাখে। বাতাসে অক্সিজেনের যোগান দেয়। অক্সিজেন ছাড়া জীবকুল বাঁচতেই পারে না।

তাহলে? বৃষ্টি হলে, ভূমিক্ষয় রোধ হলে চাষের ফলন বাড়বে। বাতাস দূষণমুক্ত হলে সবার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। অসুখ-বিসুখ কম হবে। তাই সে গাছের ফল মূল ডাল-পালা কি পাতা হয়তো তুমি ভোগ করতে পারবে না; কিন্তু তোমার, তোমার পড়শীর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তোমারই লাভ। তোমার এলাকার ফলন ভাল হলে, তোমারই লাভ। তোমার এলাকার ভূমিক্ষয় রোধ হলে, তার সুফল তুমিও পাবে। তার মানে, যার জমিতে গাছ লাগিয়ে বন তৈরী করা হোক না কেন! তার সুফল সবাই ভোগ করবে। কেউ বা সরাসরি ভোগ করবে, কউ বা ভোগ করবে অন্যভাবে অর্থাৎ সমাজের সকলেরই উপকার হবে।

তাই বলি, তোমার জায়গা থাকে ভালই; তুমি সেখানে গাছ লাগাও। না থাকে রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে, খাল-পুকুরের কিনারায় গাছ লাগাও। তাতে পরিবেশ সুস্থ থাকবে। আরও বলি গাছ লাগাও-না-লাগাও কেউ যেন অযথা গাছ কেটে বন নষ্ট করো না। পারলে গরু ছাগলের হাত থেকে গাছ বাঁচাবার চেষ্টা করো। আমার তো গাছ নয়—আমার কি দায়। অতএব চোখের সামনে গরু ছাগলে গাছ খাচ্ছে খাক্। আমি ফিরেও তাকালাম না এমনটা যেন না হয়। সমাজের সকলের স্বার্থে

গাছ লাগাতে হবে, গাছের যত্ন করতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে। সেজন্যই সামাজিক বনসৃজনের কথা বলা হয়েছে।

সমাজের উপকারের জন্য রাজ্যের আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ বন থাকা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তা নেই। এখানে তের ভাগের এক ভাগ বন আছে। যা আছে, তাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। পতিত জমিতে সবাই মিলে গাছ লাগিয়ে, সবাই মিলে গাছ বাঁচিয়ে, আশু বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে আমাদের পরিবেশকে। সকলের ভালর জন্য সবাই মিলে গাছ লাগানর নামই সামাজিক বনসৃজন। সামাজিক বনসৃজনে সরকারী বনবিভাগ ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি খুবই সাহায্য করছে। এই সুযোগ নিয়ে সামাজিক বনসৃজনের চেষ্টা করা অবশ্যই উচিত। আজকাল গাঁয়ে কোনও ভাল চাষীর হেফাজতে গাছের চারা তৈরী করে তা বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন-বিভাগ থেকে সেসব চারা কিনে নিয়ে চাষীদের বিলি করা হয়। একটা মাঝারি আকারের গাঁয়ে অন্ততঃ দশ হেক্টর বা ২৫ একর বা ৭৫ বিঘার মত বনভূমি থাকা দরকার। তাহলে ঐ বনের গাছপালা থেকেই গাঁয়ের লোকেরা জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে পারবেন। কাঠ খুঁটির চাহিদা মেটাতে পারবেন। গরু-বাছুর ছাগলকে খাওয়াবার মত ঘাস ও পাতা যোগাড় করতে পারবেন। আর কোন পরিবারের নিজস্ব সাড়ে তিন বিঘার মত বন-বাগান থাকলে বছরে অন্তত ৫০০-৬০০ টাকা বাড়তি রোজগার করা যাবে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে অনেক পতিত জমি আছে। ঐসব জেলায় জোরকদমে সামাজিক বন-সৃজনের কাজ চলছে।

কি কি গাছ লাগানো যেতে পারে

মাটির গঠন ও উচ্চতা অনুযায়ী পশ্চিমবাঙলাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। পাহাড়ী অঞ্চল—দার্জিলিং।

২। ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চল—জলপাইগুড়ি, কোচবিহার।

৩। পলিমাটি অঞ্চল—মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান (কিছু অংশে), নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর (কিছু অংশ বাদে), পশ্চিম দিনাজপুর।

৪। রাঙামাটি অঞ্চল—বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের কিছু অংশ।

৫। সমুদ্র-তটভূমি অঞ্চল—২৪ পরগণা, মেদিনীপুর (কিছু অংশ)।

এবার কোন্ কোন্ এলাকায় সামাজিক বন-সৃজনের জন্য কি কি গাছ লাগান যেতে পারে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

১। পাহাড়ী অঞ্চলে উপযোগী গাছ
(১০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু):

(ক) কাঠের জন্য—চাঁপা, সেগুন, গামার, পানিসাজ, বহেড়া, মান্দানে, শিমূল, লম্পাত, চিক্রাসি, তুন, লালী, কিম্বু, শিরীষ, চিলোনী।

(খ) জ্বালানী ও পশুখাদ্যের জন্য—সুবাবুল, কাঞ্চন, গাহসীম মাদার, বাক্সানা।

(গ) ফলের জন্য—সুপারী, কাঁঠাল, আম, জাম, জলপাই, সজিনা, পেয়ারা।

(ঘ) বাঁশ—জাওয়া, মাকালা, ভাল্কী ও লাঠি বাঁশ লাগান যেতে পারে।

(তারপর থেকে ২০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু) :

(ক) কাঠের জন্য—পানিসাজ, সউর, তিতেচাঁপ, পিপলীধূপী (১৫০০ মিটার থেকে)।

(খ) ফলের জন্য—কমলালেবু, নাসপাতি, অ্যাপ্রিকট।

(গ) জ্বালানী ও পশুখাদ্যের জন্য—ওটিস, রাতো শিরীষ, সুবাবুল, ফলিদো, মৌয়া, চাপালিশ, আমলিশো, নার্কট।

(ঘ) বাঁশ—মাক্লা, ভালু, ঝিলিং।

(ঙ) অর্থকরী গাছ—রিঠা, দারুচিনি, তেজপাতা।

[২ হাজার মিটার উপরে] :

(ক) কাঠের জন্য—ধূপি, পাটুলা, পাইন, মিঠে চাঁপ, পিপলি সউর, কাপাসী।

(খ) ফলের জন্য—নাসপাতি, কমলালেবু, আপেল।

(গ) জ্বালানী ও পশুখাদ্যের জন্য—ফুট্টা, গোগুন, নেবারো, দুধিলো, নার্কট, উটিস, রাতো, শিরীষ।

(ঘ) বাঁশ—মাক্লা, ভালু ঝিলিং।

২। ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলের উপযোগী গাছ :

(ক) কাঠের জন্য—সেগুন, চাঁপ, গামার, চিক্রাশি গোকুল, সিসু টম্পানে, শাল, জারুল, কাইঞ্জল, অর্জুন, শিমূল, শিরীষ, খয়ের, ঝাউ, রেড়ী, ছাতিম, উদাল, তাল, বকুল।

(খ) ফলের জন্য—নারিকেল, সুপারি, আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, জামরুল, জলপাই, লেবু, তেঁতুল, কুল, খেজুর।

(গ) জ্বালানী ও পশুখাদ্যের জন্য— আকাশমনি, মিনজিরি, সুবাবুল, ইউক্যালিপটাস, তুঁত, মাদার, গাছসীম, মিঞ্জরী।

(ঘ) বাঁশ—ভাল্‌কি, জাওয়া, জাতি, মাক্‌লা, মূলি।

৩। পলিমাটি অঞ্চলের জন্য ঃ

(ক) কাঠের জন্য—সিসু, সেগুন, মেহগিনি, অর্জুন, কদম, জারুল, শিরীষ।

(খ) ফলের জন্য—আম, জাম, লেবু, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, সজিনা, নারিকেল, সুপারি, সবেদা, তাল।

(গ) জ্বালানী ও পশুখাদ্যের জন্য—সুবাবুল, বাবলা, গাছসীম।

(ঘ) বাঁশ—ভাল্‌কী, জাওয়া, তরলা, (তলদা) লাঠি বাঁশ।

৪। রাঙামাটি অঞ্চলের উপযোগী গাছ ঃ

(ক) কাঠের জন্য নিম, অর্জুন, সিসু, করঞ্জ, বাবলা, মহুল, বকুল, পটাস, আসন ছাতিম, বহেড়া, কালশিরীষ।

(খ) পশুখাদ্য ও জ্বালানীর জন্য—ইউক্যালিপটাস, সুবাবুল, আকাশমনি।

(গ) ফলের জন্য—কাঠাল, পেয়ারা, কুল, আতা, কাজু, খেজুর, তাল।

(ঘ) বাঁশ—ভাল্‌কী, জাওরা, মুতি।

৫। সমুদ্র-তটভুমি অঞ্চল ঃ

(ক) কাঠের জন্য—বাবলা, সুবাবুল, আকাশমনি, ঝাউ, নিম, ফরশ, পিপুল, তমাল।

(খ) পশুখাদ্য ও জ্বালানীর জন্য—বাবলা, সুবাবুল, আকাশমনি।

(গ) ফলের জন—কাজু, নারিকেল, তাল, জাম, খেজুর, সবেদা।

(ঘ) বাঁশ—ভালকী, জাওয়া, মুঠি।

এখানে যেসব গাছের চারার নাম দেওয়া হল—তার সবই বনবিভাগের নার্সারী থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে চারা বিলি করা হয়। এমন কি বাঁশের চারাও বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

রাস্তার ধারে গাছ লাগানো

ভারতীয় রোড কংগ্রেস দেশের সমস্ত রাস্তাকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ঃ—

(ক) জাতীয় সড়ক

(খ) রাজ্য সড়ক

(গ) বড় জেলা সড়ক

(ঘ) অন্যান্য জেলা সড়ক

(ঙ) গ্রামীণ রাস্তা

রাস্তা কতখানি চওড়া, কোন বিধি-নিষেধ আছে কিনা এবং রাস্তার দু'পাশে কতটা জায়গা আছে তা বিবেচনা করে গাছ লাগাতে হবে। রাস্তার ধারে লাগানোর উপযোগী গাছের এই-সব বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। যেমন ঃ—

(ক) গাছগুলি চিরহরিৎ হবে অর্থাৎ গাছের সব পাতা একসঙ্গে ঝরে যাবে না।

(খ) ঝাঁকড়া মাথা গাছ হবে।

(গ) গাছের শিকড় যেন মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

(ঘ) গাছের ডাল শক্ত হবে যেন ঝড়ে না ভাঙ্গে। কাঠ চাঁপা, কদম, আকাশমনি, অগ্নিশিখা—এসব গাছের ডাল সহজে ভাঙ্গে এগুলি লাগানো উচিত নয়। রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জায়গার আয়তন অনুযায়ী রাস্তার একদিকে বা দুদিকেই একসারি থেকে ৫ সারি অব্দি গাছ লাগানো যেতে পারে। ছায়াঘন আর ফলের গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্বালানী ও পশুখাদ্যের উপযোগী গাছ লাগান যেতে পারে।

কত দূরে দূরে গাছ লাগানো উচিত

১। নারকেল—৭.৫ মিটার পর পর

২। আম-কাঁঠাল—১০ মিটার পর পর

৩। কৃষ্ণচূড়া—১০ মিটার পর পর

৪। বাবলা—বাবলা বীজ ১০ সেমি অন্তর লাগাতে হবে। তৃতীয় বছর থেকে একটি একটি করে গাছ কেটে ফেলে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০মিটার রাখতে হবে।

৫। সুবাবুল—১০ সেমি দূরে ঘন করে লাগাতে হবে। ৩ বছর থেকে গাছ কেটে ২½ মিটার দূরত্বে গাছ রাখতে হবে।

৬। তাল—১০ মিটার পর পর

৭। খেজুর—৩.৫ মিটার পর পর

৮। আকাশমনি ও পটাস—১ মিটার পর পর

পুকুরের পাড়ে গাছ লাগানো

অনেক পুকুর আছে, যার পাড়ে কোন গাছ নেই। পুকুরের পাড়ে গাছ লাগিয়ে বনসৃজন করা যেতে পারে। বাইরের সীমানায় আকাশমনি ও বাবলা ঘন করে লাগিয়ে বেড়া গাছ তৈরী করা যেতে পারে। পুকুর বড় হলে ১৫ মিটার পর পর

বাঁশ লাগানো যেতে পারে। পুকুর ছোট হলে চার কোণায় বাঁশ ঝাড় তৈরী করা যেতে পারে।

পাড়ের ঢালে জ্বালানী, পশুখাদ্য ও কাঠের জন্য সুবাবুল, আকাশমনি ও ইউক্যালিপটাস লাগান চলে। কাঠের গাছ ৮ মিটার পর পর লাগাতে হবে। পাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ফলের গাছ লাগানোই ভাল। জলের দিকে ঢালে তাল বা নারকেল বা খেজুর গাছ লাগানো যেতে পারে।

———

গাছ লাগান গাছ বাঁচান